গবেষণা ও গবেষণা-পদ্ধতির সহজ পাঠ

প বি ত্র স র কা র

১ ভূমিকা

গবেষণা বলতে আমি এখানে প্রধানভাবে এম ফিল বা পিএইচ ডি সংক্রান্ত গবেষণা বোঝাচ্ছি, যা বইয়ের আকারে মূলত পেশ করা হয়। ইদানীংকালে সিডি-র আকারেও পেশ করা যায়। তবে গবেষণা-প্রবন্ধ লেখার ক্ষেত্রেও এর কিছু কিছু কথা খাটবে না তা নয়। দ্বিতীয়ত, এ লেখাটিও আমি গবেষণা-প্রবন্ধের মতো ফুটনোট, রেফারেন্স ইত্যাদি দিয়ে সমৃদ্ধ করতে চাইছি না, সহজে কয়েকটি মূল কথা আপনাদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্য থেকেই এ লেখার অবতারণা।

প্রথম প্রশ্ন, গবেষণা কেন? আগে পাণ্ডিত্য শুধু গবেষণা-নির্ভর ছিল না। আমাদের অনেক প্রাতঃস্মরণীয় শিক্ষক ছিলেন, যাঁরা তেমন কিছুই লেখেননি, কিন্তু ক্লাসে এসে, নিজেদের স্মৃতিধার্য বিপুল পড়াশোনা থেকে, অনেক সময় লাইব্রেরি থেকে একগাদা বই কাউকে দিয়ে বহন করিয়ে এনে, তাঁদের অন্তহীন জ্ঞান উজাড় করে দিতেন। কাগজপত্রে গবেষণা করেননি, পিএইচ ডি, ডি লিট্ নেই বলে তাঁদের আমাদের কম পণ্ডিত বলে মনে করতে সাহস হত না। তবে এ কথা ঠিক যে, তাঁদের ক্লাসে পড়ানোর সুফল ভোগ করত অল্প কিছু ছেলে (বা পরে, মেয়েরাও), কিন্তু তাঁরা যদি লিখতেন তা হলে তার সুফল লাভ করত যে কোনো সাক্ষর ও প্রস্তুত পাঠক। প্রজন্মের পর প্রজন্ম। তাই গবেষণা, মানে পড়াশোনা আর অন্যান্য তথ্যসংগ্রহের মধ্য দিয়ে নিজের সুনির্দিষ্ট বিদ্যাপ্রকল্প যখন লিখিত বা মুদ্রিত বা কম্পিউটারে পাঠযোগ্য আকারে সকলের আয়ত্তে আসে তখন তা বিদ্যাজগতের লাভ, মূলত জাতির ও সমাজের লাভ। অপ্রকাশিত পণ্ডিতদের জ্ঞান হয়তো তাঁদের মুগ্ধ ছাত্রছাত্রীদের নোটে বা স্মৃতিতে জীবিত থাকে, কিন্তু তা এক সময় চিহ্নিত

করা কঠিন হয়ে পড়ে। যদিও এখন ভিসিডি ইত্যাদিতে তা ধরে রাখা সহজসাধ্য হয়েছে, ইউটিউব ইত্যাদি মহাশূন্য-ভান্ডারে তা জমা রাখাও সম্ভব হচ্ছে। কিন্তু লেখাই বা মুদ্রিত অক্ষরই এখনও আমাদের কাছে সবচেয়ে সহজলভ্য প্রযুক্তি, তা থেকেই আমরা এখনও সব চেয়ে বেশি জ্ঞান আর বিনোদন উপার্জন করি।

তাই খুব প্রাচীন কাল থেকেই কথার তুলনায় লেখাকে বেশি মূল্য দেওয়া হয়েছে। তার কারণ আর কিছুই না—দুটো স্বাভাবিক সুবিধে... একটি স্থানমাত্রার, লেখা সারা পৃথিবীতে পৌঁছে যেতে পারে, আর দুই কালমাত্রার, লেখা তার সময়কে অতিক্রম করে সুদূর ভবিষ্যতের পাঠকের কাছেও উপলব্ধ হতে পারে। কথার দেশকালের সীমাবদ্ধতা অতিক্রম করতে পারে বলেই লেখার দাম মানুষের সংস্কৃতিতে অনেক বেশি। আমরা যৌবনকালে অনেক জানেন, কিন্তু অল্প লিখেছেন—এ রকম যথার্থ পণ্ডিত সম্বন্ধেও অনেক লিখেছেন (অল্প জানেন কি না জানি না) ব্যঙ্গোক্তি শুনেছি, 'অমুকে বিদ্যের জাহাজ, কিন্তু সে জাহাজ তো জলে নামল না!'

ফলে, আপনি যা জানেন শুধু নয়, আপনি সেই জানার উপর নিজের মতো করে যা বোঝেন, ভাবেন, যোগ করেন বা বিয়োগ করেন—তা আপনাকে লিখে জানাতেই হবে। নইলে শিক্ষক হিসেবে অন্যদের কাছে আপনার পরিচিতি পৌঁছোবে না, পরের প্রজন্মও আপনাকে জনশ্রুতির বাইরে পণ্ডিত হিসেবে জানবে না, মুগ্ধ ছাত্রদের বাইরে পণ্ডিতসমাজে আপনি কলকে পাবেন না। আপনার কাজ অনেকটা কবি বা সৃষ্টিশীল লেখকদের মতোই—নিজেকে লিখে প্রকাশ করা, মানুষের জ্ঞানের ও বোধের সাধনায় কিছু যোগ করা।

এই লিখে নিজেকে প্রকাশ করার একটা চেহারা হচ্ছে গবেষণা। আপনার শ্রমলব্ধ জ্ঞান ও মননের শস্য একটা আচারিক (formal) পদ্ধতিতে সাজিয়ে অন্যের কাছে মুদ্রিত আকারে পৌঁছে দেওয়া। এখন গবেষণার এই আচারিক পরিবেশনের উপর জোর পড়েছে, আগে এতটা জোর ছিল না। তাই 'গবেষণা-পদ্ধতি' বলে একটা শৃঙ্খলা গড়ে উঠেছে। গবেষণার ধরনও আগের তুলনায় পালটেছে। আগেকার গবেষণা ছিল খানিকটা informal। অর্থাৎ আমি ইতস্তত পড়লাম, সেই জ্ঞানের সঙ্গে আমার চিন্তা মিশিয়ে কিছুটা লিখে দিলাম, খানিকটা armchair গবেষণার ধরনে। সাহিত্যে অন্তত লাইব্রেরি আর নিজের টেবিল-চেয়ারের বাইরে বেশি ঘোরাঘুরি করার দরকার হত না। যদিও পুরাতত্ত্বে, নৃবিজ্ঞানে, ভূবিদ্যা ইত্যাদিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা বা field-work-এর একটা বড় ভূমিকা ছিল। এখন আমরা গবেষণা বলতে যে উদ্ধৃতি, পাদটীকা, সূত্রপঞ্জি (Bibliography), পরিশিষ্ট ইত্যাদি কণ্টকিত একটা রচনা বুঝি, বুঝি ক্ষেত্র-সমীক্ষা, ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার, নানা দলিল-দস্তাবেজ ঘেঁটে দেখা, অন্তর্জাল সন্ধান ইত্যাদি—তার সুযোগ যেমন আগে ছিল না, তেমনই ছিল না তার ব্যাপ্তি আর সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা। বাংলা সাহিত্যের ছাত্ররা শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা* অনেকেই পড়েছেন, যেমন পড়েছেন প্রমথনাথ বিশীর *রবীন্দ্রকাব্য প্রবাহ*। ইংরেজ কবি এলিয়ট বা লিভিসের সমালোচনা, হার্বার্ট রিডের *The Meaning of Art*, ইত্যাদি দেখলে আমাদের কথা স্পষ্ট হবে। এ সব বই বা কাজই আমাদের মতে উৎকৃষ্ট গবেষণার ফসল। যদিও প্রমথবাবুর বইটি শুনেছি, ওই সব ফুটনোট রেফারেন্স ইত্যাদি

না থাকায় নাকি ডক্টরেট ডিগ্রি থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। সেটা পরীক্ষক বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে প্রশংসার কথা নয়। কিন্তু তখনকার অনেক গবেষণাই এই রকম ছিল। অনেকে উদ্ধৃতি যদি বা দিতেন, তার উৎস নির্দেশ করতেন না, কিংবা 'জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন' বলে ছেড়ে দিতেন। এ নিয়ে সুকুমার রায়ের 'চলচিত্তচঞ্চরি'তে একটা চমৎকার ঠাট্টা আছে। বলছে, 'এ বিষয়ে আমিও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের সঙ্গে একমত—ওদের ওখানে (বিপরীত পক্ষের আশ্রমে) না যাওয়াই উচিত।' এটা অনেক সময় কোন্ পাঠকদের জন্য বই বা লেখাটি লিখছেন তার উপরেও নির্ভর করত, সাধারণ শিক্ষিত পাঠকদের জন্য লিখলে তাঁরা ফুটনোট ইত্যাদির পথে হাঁটতেন না, ভাবতেন তা সাধারণ পাঠককে সন্ত্রস্ত করে তুলবে। অর্থাৎ একটি কোনো বিষয়কে ভিত্তি করে নিজের চিন্তাকে মেলে ধরছেন, নিজের বিশ্লেষণ, তুলনা, প্রসঙ্গবিস্তার ইত্যাদি নির্মাণ করছেন—তাই ছিল যথেষ্ট। ফুটনোট, রেফারেন্স, উদ্ধৃতি ইত্যাদি দিয়ে সাফাই তৈরি করার কোনো প্রয়াস ছিল না। অর্থাৎ যে যেটা লিখতেন তা নিজের উপর সম্পূর্ণ আস্থা নিয়ে লিখতেন, যেন তিনিই সম্ভাব্য পাঠকদের কাছে বিষয়টি সম্বন্ধে শেষ কথা বলার লোক—এই রকম একটা মনোভাব।

কিন্তু বিশেষ ভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, গবেষণার একটি নূতন মূল্য আর গুরুত্ব তৈরি হয়েছে, সম্ভবত প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে। সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে (বা কলেজে) যাঁরা শিক্ষক, তাঁদের স্থায়ী চাকরি (tenured employment) পাওয়ার জন্য গবেষণা করতেই হবে। আপনি প্রথম অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হয়ে ঢুকলেন, সেটা স্থায়ী পদ (tenured post) নয়। আপনাকে অ্যাসোশিয়েট প্রফেসর হতে হবে, নইলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসরের বেশি যোগ্যতা না দেখাতে পারলে আপনাকে বিদায় দেওয়া হবে, তখন অন্য জায়গায় চাকরির খোঁজ করতে হবে। অন্য জায়গায় গিয়েও আপনি একই চক্করে পড়বেন। যোগ্যতা বাড়ানোর জন্য আপনাকে কী করতে হবে? সেখানে ভালো পড়ানোই যথেষ্ট নয়, যাকে বলে 'পাবলিকেশন'তার নথি দেখাতে হবে। সেজন্য আপনাকে প্রবন্ধ, বইপত্র লিখে প্রকাশ করতে হবে। আমেরিকার ভাষায় এই নীতিটা হল Publish or perish! 'হয় লেখা ছাপাও নয় তো ধ্বংস হয়ে যাও!' আমাদের এখানে গবেষণা ছাপানো নিয়ে এত কড়াকড়ি হলে খুব মুশকিল হত।

আর হয়তো সেখানেই প্রধানত, 'গবেষণা-পদ্ধতি' বলতে যা বোঝায় তা গড়ে ওঠে, আর 'জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিয়াছেন' জাতীয় গবেষণার চেহারাও বদলে যায়। অর্থাৎ গবেষণা মূলত উচ্চবিদ্যাক্ষেত্রের জন্য, বিশেষজ্ঞের কাজ হয়ে দাঁড়ায়। তাই আপনারা লক্ষ করবেন, কী করে গবেষণা করতে হয় সে সম্বন্ধে Style manual ওদেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলিই বেশি তৈরি করেছে। শিকাগো, প্রিন্সটন ইত্যাদির ম্যানুয়াল তো বিখ্যাত, এমনকি নিউ ইয়র্ক টাইমসের মতো খবরের কাগজ বা নিউ ইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরির পর্যন্ত গবেষণা-পদ্ধতির উপর বই আছে। তার মানে কীভাবে লিখতে হবে, সূত্র-নির্দেশ, পাদটীকা ইত্যাদি কীভাবে দিতে হবে— সে সম্বন্ধে মোটা মোটা বই। গবেষণা মানেই দাঁড়িয়েছে ফুটনোট, রেফারেন্স, বিব্লিওগ্রাফি—এই সব। আমাদের ধারণা বিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞান থেকে গবেষণার এই পদ্ধতি সাহিত্যের গবেষণাতে বিস্তারিত হয়েছে।

মনে রাখবেন, ইউরোপের পণ্ডিতেরা এই বিষয়টা যে, খুব গ্রহণ করেছেন তা নয়।

আগেকার গেয়র্গ লুকাচ, বা ফ্রাংকফুর্ট স্কুলের আডর্নো, আলতুসের, হকহাইমার প্রমুখ পণ্ডিতেরা, ফরাসি রলা বার্ত বা জাক দেরিদা প্রভৃতি খুব একটা ফুটনোট ইত্যাদি দিয়ে লেখেননি। যদি আপনারা দেরিদার *Of Grammatology* বইটি ইংরেজি অনুবাদে পড়েন তা হলে দেখবেন তাতে দেরিদার যত ফুটনোট আছে তার তুলনায় গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের ভূমিকায় ফুটনোট অনেক বেশি আছে। তবে পরবর্তী কালে রুশ গবেষণাও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের এই ফুটনোট আর টীকা-সম্বলিত পদ্ধতিকে গ্রহণ করেছে। তাদের উৎস-নির্দেশে বইয়ের নাম সাজানোর একটু স্বাতন্ত্র্য আছে, সে কথা আমরা উৎস-নির্দেশ প্রসঙ্গে বলব।

তবু বিদ্যায়তনিক গবেষণার একটা দর্শন সারা পৃথিবীতে তৈরি হয়েছে। বিজ্ঞানে তো গবেষণা ছিলই—তত্ত্বনির্মাণ, তার পরীক্ষণ আর প্রমাণ হিসেবে তা এতদিন চলে এসেছে। বিজ্ঞানের তত্ত্বের একটা বৈশিষ্ট্য ছিল ইংরেজিতে যাকে বলে falsifiability, অর্থাৎ তাকে অপ্রমাণ করা যাবে। অপ্রমাণিত হলে সেই তত্ত্ব বাতিল হবে, অপ্রমাণকারী তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে। মানববিদ্যায় যে সব তত্ত্ব আসে তার সবগুলিকে ওইভাবে falsify করা সব সময় সম্ভব হয় না। অনেকগুলিই বিকল্প ব্যাখ্যা হিসেবে পাশাপাশি উপস্থিত থাকে। তথ্যের ভুল অবশ্য থাকতেই পারে, কিছু সিদ্ধান্তের ভুলও হতে পারে। কিন্তু মানববিদ্যার আলোচনায় অনেক ব্যাখ্যা ও বিস্তার সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয়ে যায় না। স্কুলে গণিত শিক্ষার একটা প্রসঙ্গ টেনে বলি, মানববিদ্যার 'সরল অঙ্কে'র step বা ধাপগুলির জন্যও অনেক সময় কিছু নম্বর ধার্য থাকে, তা আমাদের জ্ঞানকে বৃদ্ধি করে। বিজ্ঞানের গবেষণায় আগেকার গবেষকেরা কী বলে গেছেন তা নথিবদ্ধ করার (literature survey) গুরুত্ব খুব বেশি, তাই ফুটনোট, রেফারেন্স ইত্যাদিরও একটা প্রথা তৈরি হয়। তার প্রভাব পড়ে সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য মানববিদ্যার গবেষণায়।

বিজ্ঞানের গবেষণায় 'ভুল' করাও একটা জরুরি আর ইতিবাচক কাজ, কারণ সেই ভুলকে সংশোধন করার একটা সুযোগ থাকে। মানববিদ্যাতেও সেই সুযোগ অবশ্যই থাকে। অর্থাৎ মানুষের অনন্ত জ্ঞানসন্ধানের কাজে গবেষণা একজনের ভুল থেকে অন্যজনকে সত্যের সন্ধান দেয়, এইভাবে জ্ঞানের দিগন্তহীন রাজপথ নির্মিত হতে থাকে। তাই গবেষণা মানেই জ্ঞানের দু-ধরনের অগ্রগতি—এক তার বিস্তার, দিগন্তের সম্প্রসারণ; আর অন্যদিকে তার আরও আরও গভীরতার তলসন্ধান—একই বিষয়ের উপর আরও আরও বেশি করে জানা। এই জন্যই বার্নার্ড শ, আপনারা সকলেই জানেন, ঠাট্টা করে বলেছিলেন যে, গবেষণা হল Knowing more and more about less and less. কথাটা ব্যঙ্গের হলেও সেই কাজটা যে একেবারে মূল্যহীন তা নয়।

গবেষকরা এক হিসেবে ফেলুদার গল্পের সিধু জ্যাঠার ঠিক বিপরীত। সিধু জ্যাঠা পৃথিবীর প্রায় সব বিষয়েই জানেন। কিন্তু গবেষককে একটা ছোট জায়গায় নজর ফেলতে হয়। আগে ছিলেন এই রকম সর্বন্ধর সর্বজ্ঞানভুক মানুষ, যাঁদের polymath বলা হত, হয়তো এখনও কেউ কেউ আছেন। গবেষককে ড. সর্ববিদ্যা হলে চলে না। তিনি একটা বিদ্যাশৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে এসেছেন। পিরামিডের মতো ক্রমশ সরু হয়ে যাওয়া একটা পথে উঠেছেন। স্নাতক স্তরে সাম্মানিক পর্যায়ে একটা বিশেষ বিদ্যায় পাঠ নিয়েছেন, এম এ এম

এস্‌সি ইত্যাদিতে তাঁর বিষয় আরও সংকুচিত হয়েছে। স্নাতকোত্তর স্তরে হয়তো বিশেষ পত্র ছিল, তা তাঁর পছন্দ বা আগ্রহের ক্ষেত্রকে আরও সীমাবদ্ধ করেছে। গবেষণার ক্ষেত্র আরও বেশি সীমাবদ্ধ হবে। একটি অতি নির্দিষ্ট বিষয়ে অনুসন্ধান করে এ ফোর সাইজের দু-তিনশো পৃষ্ঠার বাঁধানো খণ্ড তৈরি করতে পারলেই গবেষকের আপাত সিদ্ধিলাভ। পরীক্ষকরা তো আছেনই সেই সিদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য।

তার অর্থ এই নয় যে, গবেষণার বিষয় অতিনির্দিষ্ট বা specialized হলেও আমাদের শুধু ওই বিষয়ে আবদ্ধ থাকলেই কাজ চলবে। যে কোনো গবেষককে তার অব্যবহিত বিষয়ের বাইরেও অনেক পড়াশোনা করতে হয়। সাহিত্যের গবেষককে ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, দর্শন, মনস্তত্ত্ব, নানা দেশের সাহিত্য, সমালোচনাতত্ত্ব, সংস্কৃতির অন্যান্য বিভাগ, শিল্পকলা ইত্যাদি সম্বন্ধে জানতে হয়। রাষ্ট্রনীতি, নৃবিজ্ঞানের কিছু ধারণা থাকলেও সুবিধে হয়। রুডিয়ার্ড কিপলিং-এর একটা কথা ছিল, He knows little English, who only English knows. সেটা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধেও বলা যায়। শুধু বাংলা আর বাঙালিতে নিবদ্ধ থাকলে বাংলা সাহিত্যের গবেষণা উৎকর্ষ পায় না।

২ লিখতে শুরু করার আগের নানা কাজ : উপাত্ত-সংগ্রহ (data collection) ইত্যাদি

২.১ বিষয় নির্বাচন : গবেষণা শুরু করার আগে অবশ্যই গবেষণার বিষয় নির্বাচন করতে হবে। এই নির্বাচনে নিজের জ্ঞানবুদ্ধি ছাড়াও শিক্ষক, বন্ধুবান্ধব, সহকর্মী, গবেষণা পরিচালক—যে কোনো যোগ্য মানুষের উপদেশ-পরামর্শ নেওয়া যায়। আসল কথা হল, আমি যে বিষয়টায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিক পাঠের উচ্চতম স্তরে ডিগ্রি করেছি, সেই বিষয়ের কোনো একটা নির্দিষ্ট এলাকায় আমি নতুন জ্ঞানের যোগ ঘটাব, ওই এলাকা সম্বন্ধে মানুষ এ পর্যন্ত যা জানে তার চেয়ে বেশি কিছু তাদের জানাব—এই হল গবেষণার মূল কথা। নতুন কিছু যদি নাও জানাতে পারি, নতুন তত্ত্বের সাহায্য নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে পুরোনো জ্ঞানের নতুন ব্যাখ্যা করতে পারি। কাজেই গবেষণার বিষয়টিতে নতুনত্ব থাকা জরুরি।

এই কথাটা সরলভাবে আর একটু বুঝে নিই। কেউ যেন এটা না ভাবেন যে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্প (আগেকার হোক বা পরেকার হোক) নিয়ে গবেষণা হয়ে গেছে, ফলে তাতে আর হাত দেওয়ার দরকার নেই। তা একেবারেই নয়। এ সম্বন্ধে নতুন খবর বেরোতে পারে (ধরা যাক মানিকের ডায়েরি পাওয়া গেছে), বা আগেই যেমন বলেছি—নতুন তত্ত্ব (মনোবিজ্ঞান, মার্ক্সীয় সমাজতত্ত্ব, গ্রন্থনবাদ, পাঠক-প্রতিক্রিয়া, লেখকের দায়বদ্ধতার নানা চরিত্র বিষয়ক দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি সংক্রান্ত) আসতেই পারে—উপরে যেমন বলা হয়েছে—ফলে তার আলোকে নতুন কথা বলার চেষ্টা করাই যায়। আর যে-কোনো সাহিত্যকর্মের দুটি দিক আছে—বক্তব্য ও ভাষা—তাই ভাষা নিয়ে আলাদা করে শৈলীগত আলোচনা করাই যায়। অর্থাৎ একটা বিষয়কেই নানা ভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখার বহু সম্ভাবনা আছে। কাজেই 'নতুন বিষয়' কথাটাকে আক্ষরিকভাবে গ্রহণ করা উচিত নয়।

আমি জানি, কোন্ বিষয়ে গবেষণা হয়েছে বা হয়নি, তা খুঁজে বার করা এই বৈদ্যুতিন

যুগেও কত কঠিন, কারণ আগে যে ভিত্তির কাজটি করা দরকার তা ভালোভাবে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ই করেনি। কোন্ বিভাগে কী কী গবেষণা হয়েছে তার তালিকা কোথাও এক সঙ্গে পাওয়া যায় না, যদিও এখন ওয়েবসাইটে কিছু কিছু তথ্য হয়তো পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট বিভাগগুলি প্রায়ই এর কোনো তালিকা প্রস্তুত রাখে না, প্রার্থীদের ডিগ্রি দেওয়া হলেই তাদের কর্তব্য শেষ হল বলে মনে করে। লাইব্রেরিতে থিসিসের কপি নিশ্চয়ই যায়, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছে—সব গবেষকের পক্ষে প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়ে লাইব্রেরি ঘেঁটে দেখা সম্ভব নয়। এ ছাড়া বাংলার গবেষণা বাংলাদেশে, ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে (দিল্লি, পাটনা, বেনারস, আলীগড়), এবং পৃথিবীর অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়েও (শিকাগো, লন্ডন, তোকিয়ো বিদেশি বিদ্যা বিশ্ববিদ্যালয়, মেলবোর্ন) হয়, ফলে গবেষকের পক্ষে সব খোঁজ পাওয়া সহজ নয়। শুনেছি আন্তর্জাতিক বাংলা বিদ্যা কংগ্রেস এর একটা সুরাহা বার করবার চেষ্টা করছে।

কিন্তু বাংলা সাহিত্যের গবেষক শুধু যে বাংলা গবেষণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবেন তাই বা কেন হবে? তিনি দেখতেই পারেন ইংরেজি সাহিত্যে বা ভারতের অন্যান্য ভাষার সাহিত্যে কী ধরনের গবেষণা হয়েছে, তা থেকে কোনো নতুন ধারণা তাঁর মাথায় আসতেও পারে। ফলে তাঁর কাজটা আরও কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

ফলে এই ঝুঁকি থেকেই যায় যে, আমি যে বিষয়ের কথা ভাবছি তা আগে কেউ ভেবেছে বা করে ফেলেছে। তখন আশার বিরুদ্ধে এই আশা করতে হয় যে, আমি আমার মতো করে কাজটা করব, কারণ কাজটা করছে ভিন্ন শিক্ষাদীক্ষার এক ব্যক্তি, ভিন্ন প্রতিবেশে, ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে।

বলা বাহুল্য, নতুন বিষয় খোঁজা খানিকটা গোয়েন্দার কাজের মতো। আগে ওই বা ওর কাছাকাছি বিষয়ে কী কী কাজ হয়েছে তা দেখে নেওয়া দরকার। একে বলে literature survey বা review। এখানে literature কথাটার মানে 'সাহিত্য' নয়, ওই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা ও গ্রন্থসামগ্রী। শুধু মুদ্রিত নয়, পাণ্ডুলিপি, রেকর্ড করা বা ভিডিও করা নানা উপাদান, মাইক্রোফিল্ম, সাধারণ ফিল্ম, ইন্টারনেট আর ওয়েবসাইটে প্রাপ্ত তথ্য, এমনকি সংশ্লিষ্ট মানুষের স্মৃতি ও মতামত (যা সাক্ষাৎকারের সাহায্যে আপনি প্রকাশ্যে নিয়ে আসবেন)—সবই এর মধ্যে থাকবে। সেইগুলি দেখেশুনে, নিজের একটা বিষয় বেছে নিতে হবে, যে সম্বন্ধে আগে কেউ বলেনি, বা আপনার মতো করে নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে বলেনি। এর পরে আপনার বিষয়টি নির্ধারিত হবে। আর Review মানেও গ্রন্থসমালোচনা নয়, একটা সার্বিক বীক্ষণ—এ সম্বন্ধে এ পর্যন্ত যা যা লেখা হয়েছে তার বিষয়ে সিংহাবলোকন, অর্থাৎ পাহাড়ের চুড়োয় সিংহের মতো পিছন ফিরে তাকানো। তা যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ হবে, কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা বা সূত্র বাদ দেওয়া চলবে না।

সেখানেই শেষ নয়। তা আপনার গবেষণা-নির্দেশকের অনুমোদন পাবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় গবেষণা সমিতির অনুমোদন পাবে, তবেই আপনার বিষয়টি পাকাপোক্ত হবে। এই বিষয়ে আপনি একটি তত্ত্বানুমান বা hypothesis উপস্থাপন করবেন—বলবেন, এই বিষয়টি কেন নতুন, এবং এ বিষয়টি নিয়ে আপনার গবেষণার অভিমুখ ও সিদ্ধান্ত কী হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে জমা দেওয়ার আগে আপনার গবেষণা-প্রস্তাবের একটি সংক্ষিপ্তসার লিখে ফেলতে হবে। তাতে বিষয়টিকে অধ্যায়ে অধ্যায়ে কীভাবে সাজাবেন তাও দিতে হবে। এই সংক্ষিপ্তসারে যে কথাগুলি থাকবে তা এই—

উপক্রমণিকা বা Introduction : তার প্রথম অংশে এ বিষয়টি জ্ঞানের যে ক্ষেত্রে একটা শূন্যস্থান পূরণ করবে, তার দাবি রাখা। এর জন্যে আগে যে সব কাজ হয়েছে সেগুলির সমীক্ষা করে, উপরে 'লিটারেচার সার্ভে' প্রসঙ্গে যেমন বলা হয়েছে, সেই শূন্যস্থানের চরিত্রটি বুঝিয়ে দেওয়া। এখানেই উপক্রমণিকার দ্বিতীয় অংশে আপনি আপনার গবেষণা-পদ্ধতির একটা হদিশ দেবেন। আপনি লাইব্রেরির কাজ (desk-work, বই ও অন্যান্য মুদ্রিত, অমুদ্রিত, মাইক্রোফিল্ম-বদ্ধ, ওয়েব-আশ্রিত সব জিনিস দেখা) করবেন, ক্ষেত্র সমীক্ষা (ফিল্ড ওয়ার্ক) করবেন সরেজমিন, সেই জায়গায় (লেখকের বাড়িতে, কর্মস্থলে, যেখানে ঐতিহাসিক নিদর্শন বা লোক-সংস্কৃতি বস্তুটি প্রচলিত আছে সেখানে ইত্যাদি) যাবেন, গিয়ে আপনার গবেষণার তথ্য (যে তথ্য আপনার তত্ত্বানুমানকে সমর্থন করবে) সংগ্রহ করবেন, মানুষের সাক্ষাৎকার নেবেন, সাক্ষ্য হিসেবে ছবি বা ভিডিও তুলবেন—এই সমস্ত বলা। সাধারণ ভাবে কোনো একটি গবেষণা-পদ্ধতি যথেষ্ট নয়, একসঙ্গে একাধিক পদ্ধতির সমন্বয় ঘটানোই ভালো গবেষণার লক্ষণ। শুধু বই ও অন্যান্য নথিপত্র পড়ে গবেষণাকে অনেকে armchair research বলে অবজ্ঞা করেন, কিন্তু কখনও কখনও তার গুরুত্বও কম নয়।

বাকি সব অধ্যায় : দ্বিতীয় কাজ হল আপনার গবেষণা-কর্মের অধ্যায়গুলি কীভাবে সাজাবেন তার একটা ছক দেওয়া। সাধারণভাবে গবেষণার মূল অংশে চার থেকে ছয় বা সাতটি অধ্যায়ের বিন্যাস প্রার্থিত, তবে দু-একটি বেশি হতেও পারে ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে। উপক্রমণিকাতে যা বলবেন তা উপরে বলা হল, অর্থাৎ সেই literature survey করে আপনি বলবেন আপনার বিষয়টি কোথায় আলাদা— কিন্তু পরের অধ্যায়গুলি নির্ভর করবে আপনার নির্দিষ্ট বিষয়টির উপর। লেখক-ভিত্তিক হলে তার বিন্যাস এক রকম হবে, genre বা সংরূপ-ভিত্তিক (ছোটগল্প, উপন্যাস, কবিতার কোনো শাখা, নাটক, শিলালিপি, অমূর্ত ভাস্কর্য ইত্যাদি) হলে তার বিন্যাস হবে আর একরকম। কোনো নির্দিষ্ট বই বা কাজ (নাটকের প্রযোজনা, চলচ্চিত্র) ইত্যাদি ধরে গবেষণা করলে তার অধ্যায়-বিন্যাস হবে আর একরকম। এলাকাভিত্তিক (জেলা, মহকুমা, ঐতিহাসিক নিদর্শন ইত্যাদি) ভাষা, লোকসংস্কৃতি, ইতিহাস, গবেষণা হলে তার ছকও অবশ্যই ভিন্ন হবে। শৈলীতত্ত্ব বা আখ্যানতত্ত্ব ভিত্তিক হলে আর-এক রকম।

পরে শোধগ্রন্থ লেখার সময়ে আপনার তত্ত্বানুমান (hypothesis) তথ্যসহযোগে বিস্তারিত ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধরনের উপাদান আর উৎসগুলিকেই আপনি আবার ব্যবহার করবেন। প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা খাতা বা কম্পিউটারে ফাইল করতে হবে, তাতে তথ্য, সূত্র এবং আলোচনার অভিমুখ সংক্ষেপে লেখা থাকবে। মূল পাঠ বা text-টি লেখা এখনই শুরু করার দরকার নেই। তবে যে সব সূত্র ব্যবহার করছেন

সেগুলির পুরো সংবাদ ওই খাতা বা ফাইলেই লিখে রাখবেন—বই হলে তার নাম, লেখক, প্রকাশের তারিখ, পৃষ্ঠা, প্রকাশস্থান, প্রকাশক (পরে 'সূত্রনির্দেশ'-এর আলোচনাও দেখুন) এগুলি খণ্ডিত বা আংশিকভাবে লেখা থাকলে পরে উদ্ধার করা অনেক সময় দুষ্কর হয়ে পড়ে। যে সব উদ্ধৃতি ব্যবহার করবেন তার সমস্ত সূত্রও, উপরের মতো, খাতা বা ফাইলে তুলে রাখবেন যাতে পরে আবার খোঁজ করতে না হয়। এই সব সংগ্রহ আর সংকলন হবে প্রতিটি অধ্যায়ের কথা ভেবে—অর্থাৎ কোন্ অধ্যায়ে ব্যবহার করবেন তা চিহ্নিত করে রাখবেন—যদি প্রতি অধ্যায়ের আলাদা খাতা বা ফাইলে সেগুলি তুলে রাখতে না পারেন। ইনডেক্স কার্ড বা সূচি কার্ডেও লিখে রাখতে পারেন, তাহলে সেগুলিকে ঠিকমতো সাজানোর একটা দায় তৈরি হবে; বর্ণানুক্রমে করবেন, না অধ্যায় অনুযায়ী বর্ণানুক্রমে করবেন তা স্থির করে নিতে হবে। আগে গ্রন্থাগারিক বন্ধুরা এই সব কার্ড ইনডেক্সের বিষয়ে চমৎকার ব্যবস্থা দিতে পারতেন। এখন কম্পিউটারে আপনার সংগৃহীত তথ্য ক্রম অনুসারে অনায়াসেই সাজিয়ে রাখতে পারবেন।

এই অনুসন্ধানের কাজ করতে করতে এমন মনে হতেই পারে যে, আপনার আগের ধারণা বদলে যাচ্ছে, আগের সিদ্ধান্ত সংশোধন করা দরকার। আপনি আপনার সংক্ষিপ্তসারে যে অধ্যায়-বিভাগ করেছেন সেগুলির পুনর্বিন্যাস দরকার হবে। তাহলে আপনার অধীক্ষকের সঙ্গে পরামর্শ করবেন। এই পুনর্বিন্যাসের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করার দরকার হলে করবেন, তবে মনে হয় তার খুব দরকার হয় না। পরে আপনার অগ্রিম উপস্থাপনার সময়ে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর ডিগ্রি সমিতির কাছে জানালেই হবে। এ সম্বন্ধে নিয়মটা অবশ্য জেনে নেবেন, তার পরে যথোচিত ব্যবস্থা করবেন।

সংক্ষিপ্তসারেও একটি সূত্রপঞ্জি বা বিব্লিওগ্রাফি অবশ্যই দেবেন। এটি এই পর্যায়ে অসম্পূর্ণ থাকবে, গবেষণা যত এগোবে ততই তার ভুক্তি (entry) বাড়তে থাকবে—কাজের শেষে তা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ হবে। পরে সূত্রপঞ্জি বিষয়ে আলোচনা দেখুন।

২.৩ মুখ্য সূত্র, গৌণ সূত্র, লঘু সূত্র এবং আলোচনা, সমর্থক পাঠ

এই তিনটি পদবন্ধ আমরা ইংরেজি primary source, secondary source আর tertiary source আর reference কথাগুলির অনুবাদ হিসেবে তৈরি করেছি। মুখ্য সূত্র বা primary source হল যা নিয়ে আপনার গবেষণা তার মূল বই বা বস্তুগুলি। যদি রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান নিয়ে আপনার গবেষণা হয় তা হলে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানগুলি; যদি আপনি নবারুণ ভট্টাচার্যের উপন্যাস নিয়ে গবেষণায় উদ্যত, তা হলে নবারুণের উপন্যাসগুলি; যদি ব্রতকথা নিয়ে আপনার সংকল্প তো ব্রতকথাগুলি; যদি আপনি বাংলার মাটির ঘরের স্থাপত্য নিয়ে ভাবেন তো বাংলার মাটির ঘরের নানা রূপ; যদি গোপাল ঘোষের চিত্রকলা নিয়ে আপনি ভাবছেন তো গোপাল ঘোষের যাবতীয় ছবি; বাদল সরকারের তৃতীয় থিয়েটারের নাটক তো সেই বিশেষ নাটকগুলি। অবশ্যই পিএইচ ডির প্রয়োজন, আপনার সময়, ডিগ্রির চাহিদা অনুযায়ী এর পরিসীমা ছোটো বা বড়ো করা যেতেই পারে। ডিগ্রির চাহিদা অর্থাৎ এম ফিল,

পিএইচ ডি, ডি লিট্ ইত্যাদি ডিগ্রির চাহিদা একরকম নয়, গবেষণাগ্রন্থের আয়তনও এক হয় না।

তার আগে, বা তার সঙ্গে সঙ্গে, আগে ইঙ্গিত দিয়েছি, আপনার বিষয়ের বাইরে যে ব্যাপক পড়াশোনা—যাকে background reading বলে, তাও চালিয়ে যাওয়া দরকার। সমাজতত্ত্ব, নৃবিজ্ঞান, সমালোচনাতত্ত্ব, রাষ্ট্রনীতি, দর্শন, মনস্তত্ত্ব ইত্যাদি। তা আপনার গবেষণাকে একটি শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড় করাবে।

আমাদের ধারণা ইন্টারনেটেও এখন কোনো কোনো বইয়ের মুখ্য সূত্র পাওয়া যায়। পৃথিবীর নানা বিশ্ববিদ্যালয় প্রচুর বই এভাবে ওয়েবসাইটে দিয়েছে, ফলে আপনাকে দেশবিদেশের লাইব্রেরি খুঁজে বেড়াতে হবে না। ইন্টারনেটে অনেক পুরোনো বইয়ের আদি সংস্করণ পাওয়া যায়।

গৌণ সূত্র বা secondary source হল এইগুলি মূল উৎসে গিয়ে সংগ্রহ করা নয়, অন্য কোনো সূত্র থেকে যা পাওয়া যায়। ধরুন রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতা, যার মুখ্য উৎস তাঁর *বলাকা* কাব্যগ্রন্থ, কিন্তু সেখানে তা একটি সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত, ওই নামে নেই। পরে রবীন্দ্রনাথ সংকলিত *সঞ্চয়িতা*-তে তা 'শাজাহান' নাম পেয়েছে। দ্বিতীয়টিকে গৌণ সূত্র বলতে আমাদের দ্বিধা হয়, কারণ এখানে নাম সহ কবিতাটির এক ধরনের সম্পূর্ণতা ঘটেছে, মূলত রচয়িতারই হাতে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কোনো নাটকের বইয়ের কবির জীবৎকালে শেষ সংস্করণ তাঁর নাটক নিয়ে গবেষণার ক্ষেত্রে আপনার মুখ্য উৎস হবে, অনেক পরে প্রকাশিত (বাংলা সন ১৪০৬) *রবীন্দ্র নাট্য-সংগ্রহ*-এর অন্তর্ভূত হলে তা গৌণ উৎস হিসেবে গণ্য হবে। তেমনই গৌণ উৎস হবে কোনো বই কেউ সম্পাদনা করে পরে বার করেছে, লেখকের অনুমোদিত শেষ সংস্করণ নয়। অসতর্কভাবে সম্পাদিত বইয়ে ছাপার ভুল থাকতে পারে, কিছু বাদও যেতে পারে।

আর লঘু সূত্র নানা রকমের হতে পারে। আপনি পুরো বইটা পেলেন না, কিন্তু তার একটা অংশ কোনো বইয়ে আছে, বা কোথাও 'উদ্ধৃত' করা হয়েছে, তাই থেকে আপনার কাজের অংশটা নিলেন। কিংবা কারও সংক্ষিপ্ত সার থেকে গল্পটা সংগ্রহ করলেন। এই সূত্র গবেষণার ক্ষেত্রে অত্যন্ত অনির্ভরযোগ্য— কিছুটা ফাঁকিবাজির সামিল, ফলে একে পরিহার করাই উচিত হবে।

আলোচনা বা (reference) হল আপনার প্রাথমিক সূত্রগুলি সম্বন্ধে আলোচনা—অর্থাৎ, বিবরণ, সমালোচনা, ডায়েরি লেখকের জীবনী ও আত্মজীবনী, খবরের কাগজে সাময়িক পত্রে তার সমালোচনা ইত্যাদি। আপনার গবেষণায় তা যতটা ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা যায় ততই ভালো। আপনার literature survey বা review-র মধ্যেই তা পড়বে।

কিন্তু এই সঙ্গে background reading সম্বন্ধে আগে বলেছি, এবার আর-একটু বলি। তা হল আপনার বিষয়টি সম্বন্ধে কিছুটা তাত্ত্বিক পড়াশোনা। ধরা যাক, আপনি কারও ছোটগল্প নিয়ে আলোচনা করবেন। তখন ছোটগল্পের রূপ, বিশ্বসাহিত্যের ছোটগল্পের বিকাশ ও রূপবৈচিত্র্য, আপনার নির্বাচিত লেখকের সঙ্গে অন্যদেশের কোনো ছোটগল্প লেখকের বিষয়বস্তু ও প্রকরণের মিল থাকলে তা দেখে নেওয়া— ইত্যাদি কাজ আপনার অবশ্যকর্তব্য হবে। আপনার নির্বাচিত চিত্রশিল্পী যদি ইম্প্রেশনিজম দ্বারা প্রভাবিত হয়ে

থাকেন তা হলে ইম্প্রেশনিজম ব্যাপারটা কখন কীভাবে ইউরোপে উদ্ভূত হল, তার বৈশিষ্ট্য ও চরিত্র কী, আপনার শিল্পী ওই প্রস্থানের কোন্ শিল্পীর/শিল্পীদের সবচেয়ে কাছাকাছি—এ বিষয়গুলি তো আপনাকে জানতেই হবে। নায়ক চরিত্রের আলোচনা করতে হলে ইয়ুং-এর মনোবিজ্ঞানে মানবচরিত্রের টাইপগুলি বিষয়ে আপনাকে জানতে হবে। উপন্যাস ছোটগল্প দুয়েরই আলোচনায় সমাজবিজ্ঞানের পাঠ দরকার, কারণ পরিবারে কার কী সমাজনির্ধারিত ভূমিকা, তা থেকে তাদের বিচ্যুতির নানা ছক—এগুলি সমাজবিজ্ঞান যেমন করে বুঝিয়ে দেয় অন্য কোনো বিদ্যা তেমনভাবে দেয় না।

২.৪ প্রাথমিক পড়াশোনার সময় দু-একটি বিষয়, ইংরেজির নানা সংকেত

বাংলা মাধ্যমে পড়া বাঙালি ছেলেমেয়েদের ইংরেজি শিক্ষার ভিত যথেষ্ট পোক্ত নয়, তা সে ক্লাস ওয়ান থেকেই পড়ুক আর ক্লাস থ্রি থেকেই পড়ুক। ব্যতিক্রম নেই যে, তাও নয়। গবেষণায় অনেক সময় তাদের ইংরেজি রেফারেন্স বই পড়তে হয়। তখন কতকগুলি শব্দসংকেত নিয়ে তাদের মুশকিল হয়। এগুলি প্রায়ই ইংরেজি বা লাতিন শব্দের সংক্ষেপ। যেমন *Anon.* এটি ইংরেজি anonymous শব্দের সংক্ষেপ, মানে 'রচয়িতা অজ্ঞাত'। এই কথাটি না জানার ফলে আমাদের এক শ্রদ্ধেয় গুরু, যিনি এক উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্র-গবেষক ছিলেন, তিনি তাকে 'Anon-সাহেব' বলে উল্লেখ করেছিলেন। তাই জনৈক ইংরেজি সাহিত্যের বিদ্বানের হাতে তাঁর যৎপরোনাস্তি হেনস্তা হয় এবং তাঁর মূল্যবান গবেষণা উপহাসিত হয়। এটা বাঙালির গবেষণার ইতিহাসের একটা বেদনার আখ্যান।

এই রকম লাতিন সংক্ষেপীকরণের একটি দৃষ্টান্ত N. B. এর পুরো বিস্তার Nota Bene অর্থাৎ 'ভালো করে লক্ষ করুন'। কেউ কেউ লাতিন বা গ্রিক শব্দসংকেতকে বক্রাক্ষর বা ইটালিক্সে দেন। নীচে আমরা তাই দিয়েছি। L মানে লাতিন। এই সব শব্দসংকেত জানা থাকলে বই পড়ার সুবিধে হয় বলে আমরা এ ধরনের কিছু শব্দসংকেতের অর্থ নীচে দিলাম—

aa = author's alteration লেখকের নিজের করা পরিবর্তন
abbr. = abbreviated, abbreviation সংক্ষেপ, সংক্ষেপিত
ab int. = L *ab initio* গোড়া থেকে
abr. = abridged সংক্ষিপ্ত
ad inf. = L *ad infinitm* অনন্ত পর্যন্ত, অন্তহীন ভাবে
ad init. = L *ad initium* গোড়াতে
ad int. = L *ad interim* এর মধ্যে
ad loc. = L *ad locum* ওই জায়গায়
anon. = anonymous রচয়িতার নাম অজ্ঞাত
app. = appendix পরিশিষ্ট
b. = born, brother জন্ম(সাল), ভাই

bibliog., = bibliography উৎসপঞ্জি
bk. = book
c., ca. = L circa [চির্কা] আনুমানিক সময়
Cantab. = Cambridge (L *Cantabridgiensis*)
cc. = copies
cf. = compare L *confer* তুলনীয়
ch., chap. = chapter
do. = L *ditto* ওই একই কথা
ed. = edited, editor, edition
eds. = editors
e.g. = such as for example, *exempli gratia* উদাহরণ হিসেবে
et al. = and others L *et alit* এবং অন্যরা
et seq. = L *et sequentes* and the following আর নীচে দেখুন
exx. = examples উদাহরণগুলি
f, ff. = following pages পরেও, পরের পৃষ্ঠাগুলিতে
f.v. = *folio verso* পৃষ্ঠার পিছনে
ibid = *ibidem* উপরের উদ্ধৃতিসূত্র, একই জায়গায়; ওই, তদেব
id. = L *idem* the same একই
i.e. = L *id est* that is, অর্থাৎ
inf. = L *infra below* নীচে
in pri. = L *in principio* in the beginning শুরুতে
l. = line
l.c. = lowercase ইংরেজি ছোটো হাতের অক্ষর
lit. = literally আক্ষরিকভাবে, আক্ষরিক অর্থে
loc. cit. = L *loco citato* উদ্ধৃত স্থানে দেখুন
op. cit. = in the work cited যে উৎসের কথা আগে বলা হয়েছে
marg. = margin
MS, ms.. mss. = manuscript, manuscripts পাণ্ডুলিপি, পাণ্ডুলিপিগুলি
misc. = miscellaneous বিবিধ
n. = L *natus born* জাত (ওই বছরে)
n.d. = no date তারিখহীন, প্রকাশনা বা চিঠির তারিখ নেই
nn. = notes ছুটকো মন্তব্যগুলি
n.p. = no place, no publisher
n.s. = new series
ob. = L *obit* মৃত (ওই বছরে)

op. cit. = L *opera citato* in the work cited উল্লেখিত উৎস দেখুন
o.s. = old series
p., pp. = page, pages অমুক পৃষ্ঠা, পৃষ্ঠাগুলি
par. = paragraph
pass. = L *passim* throughout সর্বত্র
pro tem. = L *pro tempore* for the time being ওই সময়ের জন্য, অস্থায়ী ও ভারপ্রাপ্ত
prox. = L *proximo* পরের মাসে
p.s. = postscript পুনশ্চ (জুড়ে দেওয়া বক্তব্য)
pub. = publisher
q.v. = L *quod vide* এটা বা এর জন্য দেখুন (পড়ুন)
s.c. = small capital letters ইংরেজি বড়ো হাতের অক্ষর, ছোটো সাইজে
s.a. = L *sine anno* বছর লেখা নেই, L *Sub anno* এই বছরে (মুদ্রিত, ঘটেছে)
ser. = series
syn. = synonym প্রতিশব্দ
u.c. = uppercase, ইংরেজি বড়ো হাতের অক্ষর
ut sup. = L *ut supra* as above উপরের মতো
vide = L *vide* see দেখুন (পড়ুন) viz. = L *videlicet* namely, যেমন ধরুন
vol. = volume খণ্ড (পত্রিকার ক্ষেত্রে অনেক সময় প্রকাশের বর্ষ বোঝায়)

৩ সাজিয়ে লেখার কাজ

প্রাথমিক পড়াশোনা আর তথ্য উদ্ধৃতি ইত্যাদি সংকলনের পর লেখার কাজে হাত দিতে হবে। কত তাড়াতাড়ি বা দেরিতে শুরু করবেন তার হিসেব মোটামুটি এই হবে যে, যখন আপনি মনে করবেন যে, পুরো বিষয়টির উপর আপনার একটা মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ ধারণা আর নিয়ন্ত্রণ এসেছে, তখনই আপনি লেখা শুরু করবেন। আপনার ধারণা ভুল হলেও ক্ষতি নেই, লিখতে লিখতে ধারণার ফাঁকগুলি বেরিয়ে আসবে। সাধারণভাবে নিয়ম হল প্রথম অধ্যায় অর্থাৎ উপক্রমণিকাটি সকলের পরে লেখা।

গবেষণা-গ্রন্থটিকে আমি নিজে তিনটি ভাগে ভাগ করি। মূল আলোচনাকে পাঠ বা Text ধরে নিয়ে আমি গ্রন্থটিকে Pre-Text, Text এবং Post-Text এই তিনটি ভাগে ভাগ করে নিই।

৩.১ Pre-Text বা প্রাক্-পাঠ

প্রাক্-পাঠ আসলে গবেষণার অংশ নয়, বিদ্যাগত কোনো ভিত্তি তার নেই। তা বিধিগত ও

প্রশাসনিক কর্তব্যের অংশ। যেমন মলাটে কী থাকবে, নামপত্রে কী থাকবে (গবেষণার নাম, গবেষকের নাম, কার অধীক্ষকতায় কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন্ বিভাগে, কোন্ ডিগ্রির জন্য এই গবেষণা নিষ্পন্ন হয়েছে), স্বীকৃতিপত্রে বলা হবে এই গবেষণা অন্য কোথাও কোনো ডিগ্রির জন্য জমা দেওয়া হয়নি (তার ইংরেজি লিখিত বয়ান আছে), সূচিপত্র কীভাবে দেবেন, আপনার 'ভূমিকা'তে কী লিখবেন। ভূমিকাতেই ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা স্বীকার করবেন। পরে আমরা গবেষণার ভাষা সম্বন্ধে বলব, কিন্তু আগেই বলি যে, ভূমিকাতে বা অন্যত্র 'গল্প' আনবেন না। 'আমি তারপর ওখানে গিয়ে দেখি যে, মন্দিরের টেরাকোটাগুলি একটাও অক্ষত নেই' -গোছের 'আমি-কেন্দ্রিক' বৃত্তান্তের দরকার নেই। 'মন্দিরের টেরাকোটাগুলি অক্ষত নেই' বললেই হবে। নিছক বিবৃতির ভাষায় বলবেন। অর্থাৎ কোন্ বই পড়ে আপনি সারা রাত ঘুমোতে পারেননি, কোন্ ঐতিহাসিক নিদর্শন দেখে আপনার মনে হয়েছে এক সময় বাঙালির ঐতিহ্য কী ছিল আর আজ তা কোন্ তলায় পৌঁছেছে—এসব কথার জায়গা ভূমিকা নয়। কিন্তু নিজের শিক্ষক, সহায়তাকারী, এমনকি স্ত্রী সন্তানকে কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ তো নিশ্চয়ই আছে। দরকার হলে একটি উৎসর্গপত্রও রাখা যেতে পারে।

৩.২ মূল পাঠ বা Text

অধ্যায়ে অধ্যায় সাজিয়ে আপনার মূল থিসিসটি এই অংশে নিবদ্ধ হবে। অধ্যায় অনুযায়ী কী লিখবেন, কতটা লিখবেন সেটা আপনার ব্যাপার। শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ে অঙ্ক বিভাগে একটি থিসিস সব মিলিয়ে ২২ পৃষ্ঠা হয়েছিল বলে শুনেছিলাম যখন সেখানে পড়ি। কিন্তু সাহিত্যে বা অন্যান্য মানববিদ্যায় একটি গবেষণাপত্র আড়াইশো থেকে তিনশো পৃষ্ঠা অন্তত হওয়া উচিত। অনেক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিশাল ঢাউস ঢাউস বইও পাই, সেগুলি পড়তে একটু কষ্ট হয়। আটশো, বারোশো পৃষ্ঠার থিসিসও পেয়েছি, কিন্তু সাধারণভাবে থিসিস অত বড়ো করার প্রয়োজন আছে বলে মনে হয় না।

আমাদের মতে উপসংহারের পরে সূত্রপঞ্জি বা bibliography মূল পাঠেরই অংশ, কারণ মূল পাঠের উদ্ধৃতি ইত্যাদির সঙ্গে তার নানা সংযোগ তৈরি থাকে। পাদটীকাও তাই, তা বইয়ের শেষে, অর্থাৎ উপসংহারের পরে যুক্ত হলেও সূত্রপঞ্জি তার পরেই থাকবে।

৩.৩ পর-পাঠ বা Post-Text

নানা রকমের পরিশিষ্ট বা appendices হতে পারে। একাধিক পরিশিষ্ট হলে 'পরিশিষ্ট ১' বা 'ক', 'পরিশিষ্ট ২' বা 'খ' এইভাবে সাজিয়ে দেবেন। পরিশিষ্টে কোথাও ম্যাপ, কোথাও ফটোগ্রাফ, কোথাও কোনো নথির জেরক্স, কারও পুরো সাক্ষাৎকার, লেখকের হাতের লেখার নমুনা, লেখার ডেস্ক বা ঘরের ছবি, পুরোনো বইয়ের মলাটের ছবি, লেখকের আঁকা ছবি বা আঁকিবুকি—সবই থাকতে পারে। লেখক বা গায়ক বা অভিনেতার বা পরিচালকের সাক্ষাৎকার নিচ্ছেন, এমন ছবিতে আপনিও থাকতে পারেন। আপনি যে সব

প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করেছেন গবেষণায়— →, #, ←, ≥, ≤, ইত্যাদি, সেগুলির অর্থ একটা পরিশিষ্টেও দিতে পারেন, আবার প্রাক্-পাঠ অংশেও ভূমিকার পরে দিতে পারেন। আগে প্রাক্-পাঠ অংশে বই বা পত্রপত্রিকার নামের সংক্ষিপ্তসার দেওয়া হত, যেমন Ast. = অষ্টাধ্যায়ী, NS = নাট্যশাস্ত্র, DL = Dhvanyaloka, JRAS = Journal of the Royal Asiatic Society, Mbh. = মহাভারত ইত্যাদি। কিন্তু এখন বিশদ সূত্রপঞ্জি দেওয়া নিয়ম বলে এই প্রথা বর্জিত হয়েছে।

৪ উদ্ধৃতি, উল্লেখ আর উৎসনির্দেশ

এই তিনটি বিষয়ের কথা আলাদা করে বলার দরকার আছে।

প্রথমে উদ্ধৃতির কথা বলি। উদ্ধৃতি তো দিতেই হবে, নিজের বক্তব্যের সমর্থনে বা অন্যের বক্তব্যের প্রতিবাদে। তা কতটা দীর্ঘ হবে তার নির্দিষ্ট কোনো নিয়ম নেই, তবে দু-চার লাইন থেকে আধপাতা উদ্ধৃতিই যথেষ্ট, পাতার পর পাতা উদ্ধৃতি আপনার আত্মবিশ্বাসের অভাব বোঝাবে, যাঁর উদ্ধৃতি দেবেন তাঁর সম্বন্ধেও এই ধারণা হয়তো তৈরি করবে যে তিনি অল্প কথায় বিষয়টা বোঝাতে পারেননি। ছোটো উদ্ধৃতি হলে লাইনের মধ্যেই দুটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে রাখবেন, বড়ো উদ্ধৃতি হলে আলাদা প্যারাগ্রাফ করবেন, সেখানে উদ্ধৃতিচিহ্নের দরকার নেই। উদ্ধৃত অংশটিকে একটু ভিতর দিকে ঠেলে indent করে দিলে ভালো হয়, কিংবা একটু ছোটো ফন্টে দিলে ভালো হয়। আপনার পাঠের বর্ণমাপ যদি ১৬ পয়েন্টের হয় তবে উদ্ধৃতি ১২ পয়েন্টের করে দিতে পারেন।

একটা জরুরি কথা হল, উদ্ধৃতিতে যে রকম বানান আছে সে রকম বানানই রাখবেন, ব্যত্যয় করবেন না।

এবার উদ্ধৃতির উৎসনির্দেশ। এটা গবেষণার একটা জরুরি অংশ, এটাই গবেষণাকে অনেকটা গবেষণার চেহারা দেয়। সাধারণ পাঠক এটা পছন্দ করে না, কিন্তু আপনার গবেষণা বিশেষজ্ঞের জন্য, সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। সাধারণ পাঠক যদি আপনার গবেষণা পড়তে চান তা হলে তাঁকে গবেষণার শর্ত মেনে পড়তে হবে। তাঁকে বুঝে নিতে হবে যে গবেষণা একটা বিজ্ঞানের কাজ, তাতে প্রতিটি কথা যুক্তি ও নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্যের উপর দাঁড় করাতে হয়। আমাদের গুরুস্থানীয় পণ্ডিতেরা আগে এই পদ্ধতি জানতেন না, আসলে তাঁদের সময়ে এই দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়নি—তাই তাঁরা হয়তো শুধুই উদ্ধৃতি দিতেন, কিন্তু কোনো উৎস নির্দেশ করতেন না, না হয় 'জনৈক পাশ্চাত্য পণ্ডিত' বলিয়াছেন বলে ছেড়ে দিতেন। তা করলে আপনার চলবে না। আপনাকে কার কথা, কোন্ বই বা প্রবন্ধের, কবেকার কথা ইত্যাদি সবই জানাতে হবে। আগেই বলেছি, আপনার খাতায় বা কম্পিউটারের ফাইলে, অধ্যায় অনুসারে উদ্ধৃতির উৎস আর তার সমস্ত অনুপুঙ্খ (পৃষ্ঠা—অধ্যায় ইত্যাদি লেখার

দরকার নেই, সালতারিখ, ইত্যাদি) লিখে রাখতে হবে।

উদ্ধৃতি দেবেন আপনার আলোচনার মূল পাঠের মধ্যে, অর্থাৎ text অংশে। উদ্ধৃতির শেষে বা প্যারাগ্রাফ হলে ডানদিকে নীচে আপনার সূত্রটা দিতে হবে। কীভাবে দেবেন? দেবেন দুটি প্রথম বন্ধনীর (-) মধ্যে—এই ক্রমে : প্রথমে লেখকের পদবি (বাংলা হলে নাম ও পদবি, তার পরে কমা, তার পরে যে বই বা রচনা থেকে উদ্ধৃতিটি নিয়েছেন তার প্রকাশের তারিখ, তার পরে একটি কোলন চিহ্ন (:) [এটি বিসর্গ নয়, বিসর্গের বিন্দুগুলির মধ্যে একটু সাদা ফুটো এর নাম ইংলিশ কোলন]। ওই কোলনের পরে পৃষ্ঠাসংখ্যা, তার পরে বন্ধনী শেষ। যেমন ধরুন, (রবীন্দ্রনাথ, ১৯২৪ : ১৩৪) কিংবা ইংরেজি হলে, (Bhaba, 2007 : 183)। এতে আর ওই পাতার নীচে, বা অধ্যায়ের শেষে পাদটীকার দরকার রইল না। মনে রাখবেন, সূত্র, উদ্ধৃতির হোক, বক্তব্যের হোক, তা দেখানোর জন্য এখন পাদটীকার দরকার নেই, ওই উল্লেখটুকুই যথেষ্ট। পাদটীকা শুধু পার্শ্বিক মন্তব্যের জন্য—যেমন 'এ বিষয়ে একটি ভিন্ন মতের জন্য জগদীশ ভট্টাচার্য, ১৯৫৯ দেখুন।'

আপনারা কেউ কেউ ভাবছেন, এতে তো কিছুই বোঝা যাচ্ছে না, কোন্ বই, বা কোন্ লেখা—কী ব্যাপার! অন্তত বইটার বা প্রবন্ধটার নাম তো থাকা উচিত। মোটেই উচিত নয়। তা থাকবে সূত্রপঞ্জি বা বিব্লিওগ্রাফিতে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯২৪-এ রবীন্দ্রনাথের যে বইটি প্রকাশিত হয়েছিল, ধরুন 'কালান্তর' —তার সমস্ত খবর থাকবে, লেখক, প্রকাশের তারিখ, বইয়ের নাম, প্রকাশের স্থান (কলকাতা/শান্তিনিকেতন), প্রকাশক (বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ)। তখন পাঠক সহজেই বুঝে নেবেন যে ওই উদ্ধৃতিটি রবীন্দ্রনাথের 'কালান্তর' থেকে। তেমনই (Sen, 2001 :17) সূত্র হলে বোঝাবে, R. K. Sen-এর *Mimesis* বইটির ১৭ পৃষ্ঠা, বিব্লিওগ্রাফিতে যার পুরো খবর থাকবে এইভাবে, Sen, R. K. 2001, *Mimesis*, Kolkata, Shyamaprasad College. ভাবার বইটির পুরো উল্লেখ হবে ওই সূত্রপঞ্জিতে এইভাবে—Bhaba, Homi K., 2007, *The Location of Culture*, Routledge, London and New York.

উৎসনির্দেশের পরে একটি 'নির্ঘণ্ট' (subject index) ও দিতে পারেন পরীক্ষকের সুবিধার জন্য। তবে নির্ঘণ্ট মুদ্রিত গ্রন্থে দেওয়ার নিয়ম যতটা গৃহীত, বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দেওয়া গবেষণায় ততটা প্রচলিত হয়নি। তবু এটি থাকলে ভালো হয়।

৪.১ একটি পার্শ্বিক প্রসঙ্গ : মূল উৎস বা original কাকে বলব?

এখানে বাঙালিদের কাছে 'মূল' বা original সূত্র সম্বন্ধে একটা সতর্কবাণী উচ্চারণ করি। একটা গল্প দিয়ে বলি, গল্পটা মিথ্যে নয়। আমাদের সময় একজন রুশ নোবেলজয়ী লেখক বোরিস পাস্তেরনাকের যে বইটার ইংরেজি নাম *The Last Summer* তার বাংলা অনুবাদ 'শেষ গ্রীষ্ম' বুকের কাছে নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। তখনকার দিনে এই রকম একটা দেখনদারি ছিল। এক বন্ধু, সম্ভবত ইংরেজির, সে সেটা দেখে বলল, 'ছোঃ, তুই এই ফালতু বাংলা অনুবাদটা পড়ছিস? ওরিজিনালটা পড়, *The Last Summer*, দেখবি সেটা অনেক

ভালো!' বাংলাপ্রেমিক ছেলেটি একটু কাঁচুমাচু হয়ে গেল।

হায়, তার বন্ধুও হয়তো জানে না যে, ইংরেজি *The Last Summer* বইটা 'ওরিজিনাল' নয়। বইটা রুশভাষায় মূল লেখা, নাম প্রথম সংস্করণে ছিল 'পোভেস্ত্' বা উপন্যাস (আমার রুশবিশেষজ্ঞ বন্ধু অরুণ সোমের কাছে এটা জেনেছি)। আমাদের সাম্রাজ্যবাদের অধীনতা ইংরেজির এই মাহাত্ম্য আমাদের কাছে খাড়া করেছে যে, সে ভাষা সকল জ্ঞানের উৎস। মূল উৎস হল যে ভাষায় রচনাটি প্রথম রচিত হয় সেই ভাষার বই, প্রবন্ধ ইত্যাদি। ফলে আমরা যেটাকে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' হিসেবে জানি, বাংলায় যেটি গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যের অনুবাদে 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' নাম পেয়েছিল, তার মূল নাম হল 'ভাইনা ই মির', বাংলায় 'যুদ্ধ ও শান্তি'।

৪.২ গবেষণা আর অন্য ভাষাজ্ঞান

অবশ্যই আপনাদের অনেকের বাংলা ছাড়া ইংরেজি ভাষাটাকেই বেশি করে জানার কথা। ইংরেজিভাষী বিদেশে এম এ-তেও থিসিস করতে হয়, তখন তার শর্ত হিসেবে ইংরেজি ছাড়া দুটো বা তিনটে ভাষার পড়ার মতো জ্ঞান যে আপনার আছে তার প্রমাণ দেখাতে হয়। পি এইচডির ক্ষেত্রে চারটে ভাষা। আমাদেরও তেমনই ক্লাস করে, পরীক্ষাতে পাস করে, সার্টিফিকেট দেখিয়ে, ফরাসি, জার্মান আর গ্রিক ভাষার জ্ঞান আছে তার প্রমাণ দিতে হয়েছিল। বাংলাটাকে চতুর্থ ভাষা বলে ধরা হয়েছিল। এ দেশে অত কড়াকড়ি নেই, ফলে আপনাদের ইংরেজির উপরেই বেশি নির্ভর করতে হবে। তবু আরও দু-একটা ভাষা জেনে রাখা উচিত, আর 'ওরিজিনাল' সূত্র সম্বন্ধে একটু খেয়াল রাখা ভালো। যিনি বাংলা কবিতার সঙ্গে ফরাসি কবিতার তুলনা করবেন তাঁকে তো ফরাসি শিখতেই হবে। বাংলা প্রবাদের সঙ্গে জাপানি প্রবাদের তুলনা যিনি করবেন তাঁকে জাপানি জানতেই হবে, ইংরেজি থেকে সে প্রবাদের উদাহরণ দেওয়া ঠিক হবে না। কারণ প্রবাদের একটা ভাষাতাত্ত্বিক সংগঠন আছে, তা মূল ভাষায় না দিলে তার সৌন্দর্য ঠিক বোঝা যাবে না। অনুবাদে সেটা আসে না।

৫ সূত্রপঞ্জি : Bibliography

এবার সূত্রপঞ্জির (উল্লেখপঞ্জিও বলেন কেউ কেউ) কথায় ফিরে আসি। শুধু উদ্ধৃতির সূত্র নির্দেশ করতে হবে এমন নয়, আপনি কারও কথা (নিজের কথাও হতে পারে—যা অন্যত্র আছে) এখানে উদ্ধৃত না করে নিজের মতো করে বলেছেন, তারও উৎস নির্দেশ করা উচিত। সেটা কীভাবে করবেন?

এটা দুভাবে করা যেতে পারে। প্রথমত, উদ্ধৃতির কাঁধে একটা পাদটীকার নম্বর বসিয়ে তার পাদটীকা দিতে পারেন। আগে এ রকম নম্বর বসানোর প্রচলন তত ছিল না, *, **, ***, ইত্যাদি চিহ্ন দিয়ে তার পরে পাদটীকা দেওয়া হত পাতার নীচে। এখন এই পদ্ধতি উঠে গেছে, পাতার নীচেও আর পাদটীকা দেওয়া হয় না, টাইপে অসুবিধে হয় বলে। পাদটীকা দেওয়া হয়

অধ্যায়ের শেষে, কখনও বইয়ের উপসংহারেরও শেষে, উৎস-নির্দেশের বা bibliography-র আগে। এতে টাইপ আর মুদ্রণ—দুয়েরই সুবিধে হয়।

মনে রাখবেন, উল্লেখ এক, আর পাদটীকা এক। উদ্ধৃতিটা কোত্থেকে নিয়েছেন শুধু এই খবরটুকু যদি দেওয়ার থাকে তা হলে পাদটীকায় তা দেওয়ার দরকার নেই। মূল পাঠের মধ্যে প্রথম বন্ধনীতে 'লেখক, তাঁর গ্রন্থটি প্রকাশের সাল এবং পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়াই যথেষ্ট। যেমন (Chomsky, 1965 : 2) বা (ঘোষ, নিত্যপ্রিয়, ২০১০ : ১১) ইত্যাদি। এতে কোন্ বই থেকে উদ্ধৃতি নেওয়া তা বোঝা যাবে যদি পাঠক বা পরীক্ষক বইয়ের শেষে উৎস-নির্দেশ বা bibliography দেখেন, সেখানে এই বইগুলি সম্বন্ধে পুরো খবর দেওয়া থাকবে। সেখানে ইংরেজি বইয়ের তালিকায় থাকবে—Chomsky, Noam, 1965, *Aspects of the Theory of Syntax*, Cambridge, Mass., MIT Press. তেমনি বাংলা বইয়ের তালিকায় থাকবে ঘোষ, নিত্যপ্রিয়, ২০১০, *রবীন্দ্র-বিষয়ক কড়চা*, কলকাতা, একুশ শতক। পাঠক বুঝে যাবেন যে, উদ্ধৃতিগুলি ওই সব বইয়ের ওই পাতা থেকে।

পাদটীকা দেবেন মন্তব্য যোগ করতে হলে। অর্থাৎ ধরা যাক চমস্কির performance / competence বিভাজন বিষয়ে আপনি উদ্ধৃতি তুলেছেন। কিন্তু মন্তব্যে আপনি বলতেই পারেন যে, সোস্যুরের la langue/ la parole বিভাজনের সঙ্গে তা সম্পূর্ণ এক নয়, কোথায় তফাত তাও বলে দিতে পারেন। এ সম্বন্ধে ইদানীং যে সব প্রশ্ন তোলা হয়েছে জানা থাকলে তাও বলে নিতে পারেন। নিত্যপ্রিয় ঘোষ কাদম্বরীর 'আত্মহত্যা' সম্বন্ধে যে আলোচনা করেছেন তাতে তিনি যাঁদের তথ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করেছেন পাদটীকায় তাঁদের নামও করতে পারেন। কিন্তু আপনার মূল পাঠে যদি এই বিষয়ের সাক্ষাৎ আলোচনার দরকার না হয় ওই প্রথম বন্ধনীর উল্লেখটুকুই যথেষ্ট।

আমরা উপরে সূত্রপঞ্জির আমাদের মতো একটা ছক দিয়েছি। এর নানা ব্যত্যয় হতে পারে তা আমরা পরে দেখব।

সূত্রপঞ্জি ছাড়া কোনো গবেষণাই সম্পূর্ণ হয় না। এমনিতে ইংরেজি bibliography মানে হল 'বই (নিয়ে) লেখা', কিন্তু উৎস তো শুধু বই নয়। তাতে প্রবন্ধ থাকে, অমুদ্রিত পাণ্ডুলিপি থাকে, সিডি থাকে, খবরের কাগজ থাকে, সাময়িক পত্র থাকে, চিঠি থাকে, ইন্টারনেটের সূত্র থাকে, উইকিপিডিয়ার সূত্র থাকে। সবই এক সঙ্গে তালিকাবদ্ধ করা হবে, বইয়ের সঙ্গেই অন্যগুলিও জুড়ে যাবে, কোনো একটা ক্রম অনুসারে।

কিন্তু মনে রাখতে হবে, অনেক থিসিসে যেমন দেখি— বই, পত্রপত্রিকা ইত্যাদির তালিকা আলাদা-আলাদা করে দেওয়ার দরকার নেই। সব একটি তালিকার অন্তর্ভুক্ত করলেই হবে। অবশ্যই ইংরেজি বা অন্য ভাষার উৎস—যার অধিকাংশ রোমান হরফে (ইংরেজির হরফে) দেওয়া চলে, সেগুলিকে আলাদা দিতে হবে, বাংলা উৎস আলাদা। বাংলা উৎস আগে দিয়ে পরে ইংরেজি উৎস দিতে অসুবিধে নেই।

৫.১ ক্রমটা কী হবে?

বড়ো লাইব্রেরিতে আপনারা যত কার্ড ক্যাটালগের শেল্ফ দেখেন, সেখানে প্রায়ই বইয়ের

বা পত্রপত্রিকার নাম (title) অনুযায়ী আর লেখক/সম্পাদক (author) অনুযায়ী কার্ড সাজানো থাকে। কম্পিউটারের ক্যাটালগেও তাই পাবেন। কিন্তু গবেষণার উৎসপঞ্জি বা বিব্লিওগ্রাফিতে মূলত লেখক/সম্পাদক অনুযায়ী তালিকা থাকে। এ দুইয়ের উল্লেখ না থাকলে কখনও প্রকাশকের নামও লেখকের জায়গায় চলে আসে, যেমন—বাংলা একাডেমি, বা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

আমি যতদূর দেখেছি, দুটি ক্রম উৎসনির্দেশে ব্যবহৃত হয়েছে। একটি বেশি জনপ্রিয়—লেখক অনুযায়ী (ইংরেজিতে লেখকের পদবি অনুযায়ী, নীচে দেখুন) বর্ণানুক্রম, আর একটি বইয়ের ১, ২ নম্বর দিয়ে তালিকা। সেটি মূলত প্রাক্তন সোভিয়েত ইউনিয়নের বইয়ে দেখেছি। সেখানেও লেখক (লেখকের পদবি প্রথমে দিয়ে) অনুসারে তালিকা থাকে, কিন্তু তার আগে ১, ২, ৩ নম্বর বসানোর ফলে সুবিধে এই হয় যে, সূত্রনির্দেশে আর লেখকের পদবি আর প্রকাশের সাল দেওয়ার দরকার হয় না, নম্বর আর তার পাশে কোলোন দিয়ে পাতার সংখ্যা দিলেই পাঠক পিছনে উৎসনির্দেশে গিয়ে নম্বর দেখে লেখক, বই ইত্যাদি পুরো খবর পেয়ে যান।

৫.২ বইয়ের/পত্রপত্রিকার/চলচ্চিত্র ইত্যাদির তালিকা, ইংরেজি বা রোমান বর্ণে বিদেশি ভাষার বই

বইয়ের তালিকার একটা ক্রম বর্ণানুক্রম, তা আগেই বলেছি। কিন্তু কী অনুসারে বর্ণানুক্রম? ইংরেজি বা ইংরেজিভাষায় বা রোমান বর্ণে লেখা বিদেশি উৎসের ক্ষেত্রে লেখকের পদবি অনুসারে। যেমন, Chatterji, Kshitish, 1964, *Technical Terms and Techniques of Sanskrit Grammar*, Calcutta, University of Calcutta.

৫.৩ একটি উৎসের ভুক্তিতে কী কী খবর থাকবে

উপরের দৃষ্টান্তটিতে একাধিক জিনিস লক্ষ করার আছে। প্রথম নজর করুন, কোন্ কোন্ খবর থাকতেই হবে। লেখকের নাম—তাতে আগে পদবি থাকবে (বাংলা বই হলে অনেকে বলেন লেখকের প্রদত্ত নাম আগে দিতে হবে), প্রকাশের তারিখ, বইয়ের বা পত্রিকার, বা ফিল্ম ইত্যাদির নাম ইটালিক্সে বা বক্রাক্ষরে, প্রকাশের স্থান (শহর) এবং প্রকাশকের নাম। এগুলি থাকতেই হবে বই ইত্যাদির ক্ষেত্রে। প্রকাশনার শহর একাধিক হলে, ইংরেজি বইয়ের ক্ষেত্রে যেমন হয়, দুটো শহর থাকলে London & New York লিখতেই পারেন, তার বেশি থাকলে London etc. লিখে ছেড়ে দেবেন। কখন and লিখবেন আর কখন &, তা মূলের অনুসরণে করবেন।

অবশ্যই আমি যে ভাবে দিয়েছি সেগুলি সব সময়ে এ ভাবে দেওয়া হয় না। প্রকাশের তারিখ কখনও শেষে দেওয়া হয়, কখনও প্রথম বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হয়। সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। কিন্তু আপনি যা লিখবেন একটাই লিখবেন, অর্থাৎ উপরের প্রত্যেকটা খবর যেন থাকে। অনেক জায়গায় কমার ব্যবহার না করে লেখকের নামের পরে কোলোনও (:)

ব্যবহার করা হয়। সেও আপনার বিকল্প। একটা বিকল্পই ব্যবহার করবেন। তা ছাড়া, কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাপা বইয়ে দেখছি শুধু পদবির পরে কমা দেওয়া হয়, বাকি সব জায়গায় ফুল স্টপ। বাংলায় সেটা করতে একটু অসুবিধে হতে পারে। বাংলায় কমাটা বজায় রাখাই ভালো। যা করবেন একটা করবেন। একেবারে শেষে কোনো যতিচিহ্ন নাও দিতে পারেন, আবার ইংরেজিতে ফুল্ স্টপ আর বাংলায় দাঁড়িও দিতে পারেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে অমুক স্টাইল-ম্যানুয়াল অনুসরণ করতেই হবে বিব্লিওগ্রাফির ক্ষেত্রে—এ রকম ফতোয়া জুলুম বলে মনে করি। উপরের সব খবর থাকাই যথেষ্ট।

৫.৪ সম্পাদক

যদি বইটা কোনো একজন লেখকের না হয়ে সম্পাদকের হয়? তা হলে লেখকের পদবি, নাম না লিখে সম্পাদকের কথা এইভাবে জানাবেন—Duranti, Alessandro (ed.), 2001, *Linguistic Anthropology : A Reader*, Oxford, Blackwell. একাধিক সম্পাদক হলে হবে (eds.)। বাংলায় শুধু (সম্পা.) লিখলেই হবে, বহুবচন দেওয়ার দরকার নেই। যদি এই সংকলনের অন্তর্ভূত কোনো প্রবন্ধ ব্যবহার করেন তা হলে তার আলাদা ভুক্তি হবে, নীচে যেমনভাবে বলা হয়েছে।

৫.৫ একাধিক লেখক/সম্পাদক হলে

দুজন বা বড়ো জোর তিনজন লেখক/সম্পাদক হলে তাদের নাম দেওয়াই যায়। কিন্তু সেটাতে প্রথম লেখকের (বইয়ে নাম যেভাবে দেওয়া আছে) পদবি আগে দেবেন, বাকিদের আগে নাম আর পরে পদবি দিলেই হবে। যেমন—

ইসলাম, রফিকুল ও পবিত্র সরকার (সম্পা.), ২০১২, *বাংলা একাডেমী প্রণীত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ*, ঢাকা, বাংলা একাডেমি (পরে ঢাকার বাংলা একাডেমি 'একাডেমী' বানান পরিবর্তন করে 'একাডেমি' করেছে)।

Setiraman, V.S., C.T. Indra, T. Sriraman (eds.), 1990, *Practical Criticism*, Madras etc., Macmillan India Limited.

৫.৬ সম্পাদিত বিখ্যাত লেখকের বই

জলধর সেন, ২০০৮, *বঙ্গ-গৌরব* (সুবিমল মিশ্র সম্পা.), কলকাতা, দে বুক স্টোর ইত্যাদি (পরিবেশক)। এটি সুবিমল মিশ্রের নামে আলাদা ভুক্তিও করা উচিত, যদি সম্পাদকের কোনো উদ্ধৃতি আপনি ব্যবহার করেন। সেখানে ভুক্তির চেহারাটা এই রকম হবে, সুবিমল মিশ্র (সম্পা.), ২০০৮, *বঙ্গ-গৌরব* (জলধর সেন প্রণীত), কলকাতা, দে বুক স্টোর ইত্যাদি (পরিবেশক)।

মনে রাখবেন, বইয়ের/পত্রপত্রিকার নাম ইংরেজিতে ইটালিক্‌স বা বক্রাক্ষরে দিতে হবে। বাংলায় কেউ কেউ ইটালিক্‌স ব্যবহার করেন, আবার কেউ একটি ঊর্ধ্বকমা দিয়ে ওই নাম লেখেন। আমাদের মতে বিকল্প যখন আছে, ইটালিক্‌স ব্যবহারই ভালো। তার কারণও আছে। প্রবন্ধ, কবিতা বা ছোটগল্পের ক্ষেত্রে ঊর্ধ্বকমার ব্যবহার দরকার হবে।

যদি লেখক/সম্পাদক তিনজনের বেশি হয়, তা হলে শুধু প্রথম জনের নাম দিয়ে (পদবি প্রথমে) পাশে ইটালিক্‌সে *et al.* লিখে দিলেই হয়। ও কথাটার মানে হল এবং (*et*) অন্যান্য (*alit*, সংক্ষেপে al.)।

পুরো সাইজের বইয়ের মতো করে চলচ্চিত্র, নাটক ইত্যাদিরও উৎসনির্দেশ করবেন। ওয়েবসাইটের নির্দেশ *WWW.* দিয়ে করবেন।

মনে রাখবেন, তারিখের বেলায় শুধু সাল (খ্রিষ্টিয় বা বঙ্গীয়) দিলেই চলবে, কোন্ মাসে কোন্ দিনে কোন্ তিথিতে ('রামনবমী' যেমন) প্রকাশিত হল তা দেওয়ার দরকার নেই। তেমনই প্রকাশকের ঠিকানা, আই এস বি এন নম্বর ইত্যাদি দেওয়ার দরকার নেই।

৫.৭ একই লেখকের একাধিক বই

একই লেখকের একাধিক বই থাকলে সেগুলির প্রকাশের তারিখ অনুযায়ী (আগেরটা আগে, পরেরটা পরে) পরপর সাজাবেন। লেখকের নাম আর পদবির পুনরাবৃত্তির দরকার নেই, সামনের জায়গায় একটা লম্বা ড্যাশ আর কমা দিলেই হবে। যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯০৯, *শব্দতত্ত্ব*, কলিকাতা, মজুমদার লাইব্রেরি। তার নীচে হবে —, ১৯১৬, *ফাল্গুনী*, এলাহাবাদ, ইণ্ডিয়ান প্রেস। পুরোনো দিনের বই হলে পুরোনো বানান রক্ষা করবেন। যদি ইংরেজিতে একই রকম নাম থাকে একাধিক লেখকের, Black, H. R. ধরুন দুজন লেখকের নাম, তখন তাঁদের অন্তত একজনের প্রথম নামটা পুরো লিখবেন, অন্য জন থেকে আলাদা করার জন্য। বাংলাতেও এ রকম হলে তাই করবেন।

৫.৮ প্রবন্ধের/গল্পের/কবিতার উৎসনির্দেশ

প্রথমে একইভাবে লেখকের পদবি, নাম, প্রকাশের তারিখ থাকবে, তার পরে প্রবন্ধটির নাম একটি ঊর্ধ্বকমার মধ্যে দেবেন। তার পরে যে বইয়ের/সাময়িকপত্রের মধ্যে তা ছাপা হয়েছে— 'দেখুন' বা 'দ্র.' বলে সেই বইয়ের লেখকের/সম্পাদকের ওই বই/সাময়িকপত্রের/সংকলনের ভুক্তি (entry) দেখতে বলবেন। যেমন,

প্রবাল দাশগুপ্ত, ২০১০, 'নির্বিশেষ ণিজন্তের উঁকি', দ্র. অনুপম বসু ও অন্যান্য (সম্পা.), ২০১০, *ভাষা-প্রযুক্তি*, কলকাতা, ভাষা-প্রযুক্তি গবেষণা পরিষদ, পৃ. ৬৫-৭১

কিংবা

Smith, Steve, 2006, 'Louis Althusser (1918-90)', see Simons, J., 2006, pp. 51-67. পরে আলাদা জায়গায় (Simons দিয়ে বইটির ভুক্তি থাকবে এইভাবে—

Simons, John (ed.), 2006, *Contemporary Critical Theorists*, Edinburgh, Edinburgh University Press.

যখন বইটির আলাদা ভুক্তি দেবেন তখন শেষের পৃষ্ঠাসংখ্যা দেওয়ার দরকার নেই।

৫.৯ উৎস নির্দেশের মধ্যে কোন্ বই দেবেন, কোন্ বই দেবেন না

ভাষাতত্ত্বের গবেষণা ছাড়া, এবং জরুরি না হলে কোনো অভিধান তালিকায় আনবেন না। আপনি কোনো শব্দের বানান চলন্তিকা বা হরিচরণে দেখে নিয়েছেন, লেখার সময় আপনার টেবিলে বইগুলি ছিল, তা জানাবার জন্য উৎসনির্দেশে সেগুলিকে তালিকাভুক্ত করার দরকার নেই।

যে বইগুলির বিদ্যাগত (অ্যাকাডেমিক) মান স্বীকৃত, সেগুলিই উৎসনির্দেশে দেবেন। যদি আলোচনার বিষয় না হয়, তা হলে বাজারের শিশুপাঠ্য জীবনী বা সাংবাদিকতাধর্মী বই ওই তালিকায় আনবেন না। কেউ হয়তো রবীন্দ্রনাথের বা অন্যান্যদের জীবন নিয়ে বাজার-ধরার রসালো উপন্যাস লিখেছেন, সেগুলিকে, বা সেগুলির বিচার ও সিদ্ধান্তকে, রবীন্দ্রনাথের জীবনের তথ্যমূলক উৎস হিসেবে গণ্য করবেন না। ইংরেজিতে যাকে standard reference বলা হয় সেই সব বই বা পত্রপত্রিকা তালিকায় থাকবে। অবশ্য লিটল ম্যাগাজিনে সমস্ত রকম বিদ্যায়তনিক শর্ত মেনে লেখা ভালো প্রবন্ধকে অবশ্যই উৎস হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে। ফলে উৎসের ক্ষেত্রে ঝাড়াই-বাছাই করতে হবে।

৬ গবেষণার ভাষা ও বানানরীতি

গবেষণার ভাষা যথাসম্ভব অনাসক্ত, নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ হওয়া উচিত। 'আমি'-র প্রক্ষেপ না হওয়াই ভালো— 'আমরা বলি' না বলে 'এ কথা বলা যেতে পারে যে' লেখা ভালো। (আগেই বলেছি, আমার এই প্রবন্ধের ভাষা গবেষণার ভাষা করার চেষ্টা করিনি)। কাউকে তীব্র আক্রমণ করবেন না, কাউকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করবেন না।

'অনন্যসাধারণ', 'আশ্চর্য' ইত্যাদি কথার বদলে 'উল্লেখযোগ্য', 'বিখ্যাত', 'প্রসিদ্ধ', 'মৌলিক' ইত্যাদি কথাগুলি ব্যবহার করতে পারেন। 'উনি বিষয়টা বোঝেননি' না বলে বলবেন, 'সম্ভবত এই দিকগুলি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে', 'উনি ভুল করেছেন' না বলে 'ওঁর এই সিদ্ধান্ত নানা কারণে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে না' বলাই ভালো।

লক্ষ করুন—এই ভাষার দুটি দিক আছে। এক হল, ভাষাটির একটি নিজস্ব গাম্ভীর্য রক্ষা করা দরকার, যাতে 'ভুল করেছেন', 'বাজে বকেছেন', 'প্রলাপ বকেছেন', 'দারুণ বলেছেন' এই ধরনের অনুকূল বা প্রতিকূল আবেগজাত লঘু কথা বলা সংগত হবে না। গবেষক সব সময় একটি ব্যক্তিগত দূরত্ব রক্ষা করবেন। দ্বিতীয়ত, এর সঙ্গে প্রাসঙ্গিকভাবেই, একটি সামাজিক সৌজন্য রক্ষা করতে হবে। মনে রাখবেন, যিনি ভুল করেন, তিনিও গবেষণায় একভাবে সাহায্য করেন। ভুল ধরিয়ে দেওয়ার সুযোগ তৈরি করে।

বানানরীতি সম্বন্ধে অনেকের ধারণা খুব স্পষ্ট নয়। উচ্চতম শিক্ষিতেরাও অনেক সময় বানান ভুল করেন, এবং সে বিষয়ে সচেতন নন। তা দেখিয়ে দিলে অনেক সময় বলেন, 'ওই তো বাংলা আকাদেমি সব হ্রস্ব ই-কার হ্রস্ব উ-কার করে সব সহজ করে দিয়েছে, মূর্ধন্য ণ তুলে দিয়েছে।' কথাটা একেবারেই সত্য নয়। আপনারা বাংলা আকাদেমির বানানের নিয়ম দেখুন, বাজারে প্রচলিত বানান-অভিধানে তা পাবেন। আমাদেরও একটি আছে, *ব্যাবহারিক বাংলা বানান অভিধান* (লতিকা প্রকাশনী)। অশোক মুখোপাধ্যায়ের *সংসদ বাংলা বানান অভিধান*ও দেখতে পারেন।

৭ গবেষণা বিষয়ে নানা সামাজিক প্রতিক্রিয়া

আপনি গবেষক, কাজেই গবেষণা করে আপনি একটা ভালো এবং জরুরি কাজ করছেন এমন মনে হতেই পারে। কিন্তু গবেষণা সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের, সৃষ্টিশীল লেখকদের (বিশেষ করে কবিদের) এবং 'বুদ্ধিজীবী'দের একটা অবিশ্বাস, ভীতি এবং বিদ্রুপের মনোভাব আছে সেটা মনে রাখবেন—এটা সাধারণভাবে 'পণ্ডিত'দের সম্বন্ধেই আছে। মুজতবা আলী প্যারিসের সরবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় সম্বন্ধে জানিয়েছিলেন যে, এক ধোপা তার গাধা নিয়ে সেখানে কী হয় জিজ্ঞেস করায় উত্তর পেয়েছিল যে সেখানে ডক্টরেট দেওয়া হয়। তাতে সে বলেছিল, আমার এই গাধাটার জন্য একটা ডক্টরেট কিনে নিতে পারি না? প্রমথনাথ বিশীরও সম্ভবত ডক্টরেট সম্বন্ধে একটি ব্যঙ্গরচনা আছে। ব্যঙ্গ আছে পরিমল রায়েরই *ইদানীং* নামে অতিশয় স্বাদু বইটিতে 'শিউপূজন' নামক রচনায়।

কিন্তু যে কোনো কাজ সম্বন্ধেই নানা রকম দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, ব্যক্তিগত ঈর্ষা, বা রাজনৈতিক শত্রুতাও কখনও তাকে প্রভাবিত করে। অনেকে তাই নিয়ে ভুগেছেন। এই সব সামাজিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া থেকে গবেষণার গুরুত্বই প্রতিষ্ঠিত হয়। উচ্চবিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে তার মূল্য আর অস্বীকার করা যায় না।

তবে, বিনীতভাবে বলি, উন্নত দেশগুলিতে ডক্টরেট নিয়ে কোনো প্রদর্শনপ্রিয়তা নেই। আমাদের দেশে আছে। এখানে তো গ্রামের দিকে এক সময় মাধ্যমিকের ডিপ্লোমাও ফ্রেমে বাঁধিয়ে দেয়ালে টাঙিয়ে রাখা হত। দক্ষিণ ভারতে, হয়তো উত্তর ভারতেও বিয়ের চিঠিতে পাত্র বা পাত্রী যে B.A. (Plucked) মানে বি এ ফেল-করা তা জানিয়ে দেওয়া হত। তাই আমাদের দেশেও টেলিফোন তুলে অনেকে বলেন, 'আমি ডক্টর অমুক বলছি।' বা নিজের চিঠিতেও সই-করা নামের আগে ডক্টরেট বসান। আমাদের মতে—তাতে অবশ্যই মতভেদের সুযোগ আছে—তার দরকার নেই। বেশিরভাগ লোক বইয়ে গ্রন্থকারের নামে ড. ব্যবহার করেন না বলেই হয়, সেগুলি ইংরেজি বই দেখলেই বোঝা যায়।

আপনাদের গবেষণার পথ সহজ হোক, গবেষণা আপনার নিজের এবং মানবসমাজের জন্য সার্থক হোক। কিন্তু শুধু গবেষণা যেন আপনাকে অন্যদের চেয়ে উঁচুদরের লোক বলে ভাবতে উসকানি না দেয়।